# 239417 - সঠিক তারবিয়া ইসলামিয়ার রূপরেখা কী?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: অনেকে আছেন বাচ্চাদেরকে কুরআন শরীফ মুখস্ত করান যেহেতু কুরআন শিখানোর শিক্ষক পাওয়া যায়, ফিকাহ শিক্ষা দেন যেহেতু শাইখ ও শিক্ষক পাওয়া যায়। কিন্তু, আমাদের চলাফেরা, জীবন ধারণ ও অন্যদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আমরা যথাযথ তারবিয়া বা চারিত্রিক শিক্ষার ঘাটতি লক্ষ্য করছি। অন্য কথায় তারবিয়ার ক্ষেত্রে চরম ও ভয়াবহ শূণ্যতা রয়েছে। তারবিয়ার কারিগর কোথায় আছে? তারবিয়ার শিক্ষক গড়ে তোলার পদ্ধতি কী?
শরয়ি শিক্ষা কারিকুলাম তারবিয়া বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পন্থা কী হতে পারে? তারবিয়া ছাড়া ইল্ম অর্জন করার উপকারিতা কী? আমাদের এ বিষয়টি বুঝেই আসে না শিক্ষকদের মাঝ থেকে তারবিয়া শেখানোর বিষয়টি হারিয়ে গেল কিভাবে? অন্যথায় তারা শিক্ষাক্ষেত্রে এলেন কেন? আর তারবিয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা; সে দৈন্যদশা সম্পর্কে আপনি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারেন। এরপরে আর কোন দৈন্যদশা হতে পারে না!
কিভাবে আমরা তারবিয়া শিক্ষাদানে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা গড়ে তুলতে পারি? তারবিয়া কি স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি শাস্ত্র? নাকি এটি আলেমগণের বোধশক্তি ও উদ্ভাবনীশক্তির উপর নির্ভরশীল?
আগেকার দিনে আলেম-ওলামা, রাজা-বাদশা, সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোকেরা তাদের সন্তানদেরকে কিভাবে তারবিয়া শিখাতেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

একটু গভীর চিন্তাভাবনা করেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এটা সুস্পষ্ট যে, অনেক সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে ইল্ম ও আমল, জ্ঞান ও তারবিয়া (চারিত্রিক শিক্ষা) এর মাঝে একটা বিচ্ছেদ গড়ে উঠেছে। এ কারণে তাদের অনেকের ধারণা, তারবিয়া হচ্ছে- তত্ত্বীয় জ্ঞান নির্ভর বিষয়। পিতামাতা কর্তৃক সন্তানদেরকে যতবেশি তথ্য ও টেক্সট গিলানো যায় এর সাথে তারবিয়া সম্পৃক্ত। এর সাথে পিতামাতাকে তারবিয়া দানের পদ্ধতি সম্পর্কে লেখা হয়েছে এমন বিশাল সংখ্যক বই-পুস্তক ও গবেষণাপত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তারা শরয়ি দলিলগুলোর কর্মগত শিক্ষা (তারবিয়া আমলী) কে বাদ দিয়ে দলিলগুলোর মস্তিষ্কপ্রসুত বিভিন্ন তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে-

আল্লাহ্‌র বাণী: "আল্লাহ্‌কে তারাই ভয় করেন; আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী"[সূরা ফাতির; আয়াত নং- ২৮] কে তারা শরয়ি হুকুম-আহকামে পারদর্শী আলেম ও বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টাল জ্ঞানে পারদর্শী বিজ্ঞানী উভয়ের ব্যাপারে গ্রহণ করেন। অথচ আয়াতে কারীমাতে এমন প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক জ্ঞানীই আল্লাহ্‌কে ভয় করেন। বরং আয়াতটি প্রমাণ করছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে সেই জ্ঞানী।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, "আল্লাহ্‌কে তারাই ভয় করেন; আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী"[সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮] এ বাণীটি প্রমাণ করছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে সেই জ্ঞানী। এ ব্যাখ্যাই সঠিক। এ বাণীটি এ কথা প্রমাণ করে না যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই আল্লাহ্‌কে ভয় করে।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (৭/৫৩৯) থেকে সমাপ্ত]

তিনি অন্য এক স্থানে (৭/২১) বলেন:

আয়াতের অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ্‌কে কেউ ভয় করে না; তবে আলেমেরা ছাড়া। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা জানাচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে সেই আলেম। যেমনটি অন্য আয়াতেও বলেছেন: "যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বলুন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান?'[সূরা যুমার, আয়াত: ০৯][সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম যে আয়াতটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন সেটিকেও এর প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে ভিন্নার্থে ব্যাখ্যা করা হয়। আমল ও তারবিয়া বিহীন জ্ঞান ও শিক্ষার প্রশংসার পক্ষে দলিল হিসেবে আয়াতটিকে পেশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তারা আয়াতটির প্রথমাংশের পরিবর্তে শুধু শেষোংশ উল্লেখ করেন। অথচ আয়াতটির শেষোংশ "যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান?" এর তাফসির রয়েছে আয়াতের প্রথমাংশে "যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?)"। আয়াতের শেষোংশে যাদেরকে জ্ঞানী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতের প্রথমাংশে তাদেরকে জান্নাত ও আল্লাহ্‌র রহমতের আশাপ্রার্থী হয়ে, জাহান্নামের ভয়ে ভীত হয়ে রাতের প্রহরসমূহে বিনয়াবনত হয়ে নামায আদায়কারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যাদেরকে জ্ঞানহীন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তারা এ সকল আমল সম্পর্কে গাফেল। এভাবে বিষয়টি একটু ভেবে দেখুন।

এ কারণে ইবনুল কাইয়্যেম 'মিফতাহুস সাআদা' গ্রন্থে (১/৮৯) একটি মূলনীতি নির্ণয়ন করতে গিয়ে বলেন: "সলফে সালেহীনগণ শুধু সেসব ইল্মকে ফিকাহ বলতেন যেসব ইলমের সাথে আমল পাওয়া যেত"[সমাপ্ত]

আমাদের সলফে সালেহীনদের নিকট এটাই হচ্ছে ফিকাহের স্বরূপ; অর্থাৎ ইলমের সাথে আমল। এই হাকীকত যখন অনেক দাঈ, শিক্ষক ও প্রতিপালকদের মাথা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন তারা মানুষের চরিত্র ঠিক করার পরিবর্তে, অন্তরকে সংশোধন করার পরিবর্তে, আত্মার পরিচর্যার বদলে, আখলাককে পরিশীলিত করার বিপরীতে তাত্ত্বিক মস্তিষ্কনির্ভর তারবিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তারা ভাবেন, এটাই হচ্ছে- ঈপ্সিত তারবিয়া, কাঙ্ক্ষিত ফিকাহ; কিন্তু আসলে ব্যাপারটি এমন নয়।

চরিত্র ও দ্বীনদারি শিক্ষা দান রব্বানী (আল্লাহ্‌প্রিয়) লোকদের ছাড়া সম্ভবপর নয়। চাই তারা আলেম হন, দাঈ হন, সংস্কারক হন কিংবা শিক্ষক হন। রব্বানী হচ্ছেন তিনি যিনি ইল্‌ম, আমল ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রব্ব এর সাথে সম্পৃক্ত থাকেন।

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, “বরং তিনি বলবেন, তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।”[সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৭৯]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) ফাতহুল কাদির গ্রন্থে (১/৪০৭) বলেন:

رَبَّاني রব্বানী শব্দটি رَبّ শব্দের দিকে منسوب (সমন্ধীয়)। مبالغة (আধিক্য) বুঝানোর জন্য رب শব্দের শেষে ان (আলিফ-নূন) বৃদ্ধি করে رَبَّاني শব্দটি গঠন করা হয়েছে। যেমন বড় لحية বা দাঁড়িওয়ালা লোককে বলা হয় لِحْياني বড় جُمَّة বা চুলওয়ালা মানুষকে বলা হয় جُمّاني প্রশস্ত رقبة বা গর্দানের মানুষকে বলা হয় رقباني

কারো কারো মতে, রব্বানী হচ্ছেন যিনি ভারী ভারী জ্ঞানের পূর্বে মানুষকে ছোট ছোট জ্ঞান শিক্ষা দেন। এভাবে সে শিক্ষক যেন সহজীকরণের ক্ষেত্রে রব্বকে অনুসরণ করছেন।”[সমাপ্ত]

সারকথা হচ্ছে: অবস্থার পরিবর্তনহীন নিছক কিছু কথামালা তারবিয়া নয়; ঈমানী ভাবাবেগমুক্ত নিছক কিছু শব্দমালা তারবিয়া নয়। বরং তারবিয়ার ভিত্তি হচ্ছে- সুদৃঢ় মানসিক ক্ষমতা অর্জন। এর মাধ্যমে ব্যক্তি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাঝে সমন্বয় করবে। গূঢ় তত্ত্ব ও বোধের মধ্যে সংযোজন করবে। যা জানবে তা আমল করবে। যা বুঝবে তা শিক্ষা দিবে। এ কারণে ইমাম শাওকানী ( وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ) “এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।” আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি تدرسون শব্দটিকে তাশদীদ দিয়ে পড়বে তার কর্তব্য হবে, رباني শব্দটিকে ইল্‌ম ও তালীম এর চেয়ে অতিরিক্ত একটি অর্থে গ্রহণ করা। সেটা হতে পারে, মুখলিস হওয়া, প্রজ্ঞাবান হওয়া কিংবা সহিষ্ণু হওয়া; যাতে করে কারণটি প্রকাশ পায়।

আর যে ব্যক্তি শব্দটিকে সাকিন দিয়ে পড়বে তার জন্য শব্দটিকে আলেম অর্থে গ্রহণ করা জায়েয হবে; যিনি মানুষকে

শিক্ষাদান করেন। তখন আয়াতটির অর্থ হবে, যেহেতু আপনারা আলেম সুতরাং আপনারা শিক্ষক হন। যেহেতু আপনারা ইল্ম অধ্যয়ন করেন সেহেতু আপনারা শিক্ষক হন।

এভাবে এ আয়াতে কারীমাতে ইল্ম অনুযায়ী আমল করার প্রতি জোরালোভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইল্ম অনুযায়ী আমল করার সবচেয়ে বড় পন্থা ইল্ম শিক্ষাদান করা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া।[ফাতহুল কাদীর (১/৪০৭) থেকে সমাপ্ত]

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হল যে, রাব্বানী তারবিয়ার মূল ভিত্তি হচ্ছে আদর্শ দিয়ে তারবিয়া প্রদান; কর্মহীন কথা দিয়ে নয়। তাই হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) তাঁর লিখিত একটি পুস্তিকাতে বলেন, "পরবর্তীদের জ্ঞানের উপর পূর্ববর্তীদের জ্ঞানের মর্যাদা"।[পৃষ্ঠা-৫]

পরবর্তী যামানার অনেক মানুষ এ ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তারা ধারণা করেছেন যে, দ্বীনি বিষয়ে যিনি বেশি কথা বলতে পারেন, বেশি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে পারেন তিনি অন্যের চেয়ে বড় জ্ঞানী!!

এটি নিরেট মূর্খতা। আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), আলী (রাঃ), মুয়ায (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ), যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) প্রমুখ বড় বড় আলেম সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে দেখুন; তাঁরা কেমন ছিলেন: তাঁদের কথাবার্তার পরিমাণ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর চেয়ে কম ছিল। কিন্তু, তাঁরা ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর চেয়ে বড় আলেম ছিলেন।

তাবেয়ীদের কথা সাহাবীদের চেয়ে বেশি ছিল; অথচ সাহাবীরা তাবেয়ীদের চেয়ে বড় আলেম ছিলেন।

তাবে-তাবেয়ীদের অবস্থাও একই রকম। তাবেয়ীদের চেয়ে তাদের কথা বেশি ছিল; অথচ তাবেয়ীরা তাদের চেয়ে বড় আলেম ছিলেন।

সুতরাং, বেশি বেশি বর্ণনা করতে পারা, কথা বলতে পারা ইল্ম নয়। বরং ইল্ম হচ্ছে- এমন একটি নূর যা অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়; যার মাধ্যমে বান্দা হককে বুঝতে পারে, হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে এবং ঈপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় এমন সংক্ষিপ্ত কথার মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করতে পারে।[সমাপ্ত]

মুসলিম পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যে সমস্যাগুলোতে জর্জরিত এর মধ্যে বড় একটি সমস্যা হচ্ছে: সৎ ও আল্লাহ্‌ওয়ালা আদর্শ তাদের সামনে না থাকা; যে আদর্শ মানুষ তাদেরকে কথার আগে কাজ দিয়ে শিখাবেন। তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে নির্ভুল উক্তির সাথে সৎ কর্মকেও সমন্বিত করবেন; হিকমতের সাথে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের সঠিক বুঝ ও উদ্দেশ্য মোতাবেক।

ইবনুল জাওযি বলেন, জেনে রাখুন সন্তানকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার উদাহরণ হচ্ছে বীজের মত। আদব শিক্ষাদানকারী হচ্ছেন জমিনের মত। যদি জমিন খারাপ হয় তাহলে বীজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর জমিন ভাল হলে বীজ অঙ্কুরিত হবে ও বৃদ্ধি পাবে।”[ইবনুল মুফলিহ এর ‘আদাবুস্ শারইয়্যাহ’ (৩/৫৮০)]

উম্মতের আলেম ও নেককারদের মধ্যে যাদের সন্তান নেককার হয়েছেন তারা এভাবেই হয়েছেন। ফকিহবিদ ও আদর্শিক শিক্ষকদের মধ্যে যারা নেককার মানুষ বানিয়েছেন তারা এভাবেই বানিয়েছেন। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপায়-উপকরণের দৌড় শেষ হয়ে যায়। বিষয়গুলোকে আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিতে হয়; যিনি মানুষের সকল কর্মের স্রষ্টা, যিনি মানুষের সঠিক পথের দিশারী। শিক্ষক ও পিতামাতা সর্বোচ্চ যা করতে পারেন সেটা হচ্ছে- শাসন করা, সংশোধন করা। কিন্তু, সৎ বানানো ও অন্তরগুলোকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো হাতে নেই।

এ কারণে বলা হয়: “শাসন করা পিতামাতার কর্তব্য। আর সৎ বানানো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।”[ইবনুল মুফলিহ এর ‘আল-আদাবুস্ শারইয়্যাহ’ (৩/৫৫২)]

সর্বশেষে কথা হচ্ছে-

যথাযথ তারবিয়া বাস্তবায়নের উপায় সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। দাঈ ও শিক্ষকগণকে তারবিয়ার স্বরূপ-প্রকৃতির ব্যাপারে সচেতন করে তোলা।

২। মুসলিম উম্মাহর সর্বস্তরের সংস্কারকগণকে রাব্বানী তারবিয়ার উপায়-উপকরণের সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

৩। সংস্কারকগণ কর্তৃক মুসলিম সমাজের ভাল ও নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি তারবিয়া শিক্ষা দেয়ার জন্যও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সেসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করার জন্য উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে কিছু রাব্বানী শিক্ষক গড়ে তোলা।

আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।